आचार्य
श्री नरेंद्र मोदी
ACHARYA (CHANCELLOR)
SHRI NARENDRA MODI
उपाचार्य
प्रो. विद्युत चक्रवर्ती
UPACHARYA (VICE-CHANCELLOR)
PROF. BIDYUT CHAKRABARTY

विश्वभारती
VISVA-BHARATI
(Established by the Parliament of India under
Visva-Bharati Act XXIX of 1951
Vide Notification No. : 40-5/50 G.3 Dt. 14 May, 1951)
संस्थापक
रवीन्द्रनाथ ठाकुर
FOUNDED BY
RABINDRANATH TAGORE

शांतिनिकेतन - 731235
SANTINIKETAN - 731235
जि.बीरभूम, पश्चिम बंगाल, भारत
DIST. BIRBHUM, WEST BENGAL, INDIA
फोन Tel: +91-3463-262 451/261 531
फैक्स Fax: +91-3463-262 672
ई-मेल E-mail: vice-chancellor@visva-bharati.ac.in
Website: www.visva-bharati.ac.in

सं./No.______________ दिनांक/Date.______________

22 August, 2020

আমার সহকর্মী, ছাত্র-ছাত্রী এবং গ্রাসাচ্ছদন ও ব্যক্তিগত সমৃদ্ধির প্রশ্নে বিশ্বভারতীর উপর নির্ভরশীল বন্ধুদের উদ্দেশ্যে-

"বহিরাগত এবং বেড়া / ব্যারিকেডিং/প্রাচীর নির্মানের ইতিহাসের প্রেক্ষাপট"

১৭ আগস্ট, ২০২০ সমস্ত ভণ্ডদের জন্য ছিল একটি লাল-পত্র দিবস, যারা গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং তাঁর শান্তিনিকেতনের প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শনের নামে পূর্ণ পেশী-শক্তি নিয়ে ভাঙচুর-লুঠতরাজে মত্ত হয়েছিল। দুর্বৃত্তরা কেবল তাদের রাজনৈতিক কর্তাদের দ্বারা উৎসাহিত এবং নেতৃত্ব দিয়েছিল তাই নয়, পরবর্তি প্রজন্মের জন্য গুরুদেবের রেখে যাওয়া মহান-ঐতিহ্যকে ভূলুন্ঠিত করেছে। কেবল তিন ঘন্টার মধ্যে গুরুদেবের গর্ব ও তাঁর প্রিয় বিশ্বভারতীর সাংকেতিক কাঠামোকে ভেঙে চূড়মার করে দিয়েছে। খুব সরল ও সাধারণ ভাবে বলা যায় এই কার্যকলাপ ছিল কতিপয় মানুষের নির্দেশে পেশী-শক্তির প্রকাশ ও প্রয়োগ। রাবীন্দ্রিকরা গর্বের সাথে যে রীতিনীতি লালন-পালন করেন, তার সাথে সম্ভবত ১৭ আগস্টের ঝড়ের গতিতে ঘটানো ধংসাত্বক লীলাখেলার কোনো সাদৃশ্য থাকতে পারে না।

এই বার্তালাপে আমি দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলকপাত করতে চাই: (ক) বোলপুর বা পশ্চিমবঙ্গের বাইরের যে সকল সহকর্মীরা রাবীন্দ্রিক হয়ে উঠার

জন্য আবেগগতভাবে সজ্জিত নন তাদের বহিরাগতের তকমা দিয়ে বিচ্ছিন্ন করে রাখা, বাদ দেওয়া এবং অপসারণের ধারাবাহিক প্রচেষ্টা এবং (খ) বিশ্বভারতীর ঐতিহ্যের বিপরীতে বেড়া / প্রাচীর / দেয়াল নির্মাণের অভিযোগ একেবারে ভিত্তিহীন, যেহেতু নীচে দেখানো হবে, বিশ্বভারতীর পবিত্রতা, অখণ্ডতা বজায় রাখার জন্য, যাদুঘরে রাখা মূল্যবান জিনিসপত্রের নিরাপত্তা, সামাজিক ভাবে বিচ্যুত উপাদানগুলির প্রবেশ রোধ এবং অসামাজিক ও বিপজ্জনক ক্রিয়াকলাপ বন্ধ করা (যেমন জুয়া খেলা, মদ্য পান করা, পতিতাবৃত্তি সহ যৌন ক্রিয়াকলাপ) ইত্যাদি ইত্যাদি একাধিক প্রাসঙ্গিক কারনে ক্যাম্পাসে সীমারেখা নির্মাণের অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে।

ক) রাবীন্দ্রিক হিসাবে বহিরাগতদের কোনও স্থিতাধিকার নেই' এই অভিযোগ সম্পর্কেঃ-

১) পাঠকদের মনে করিয়ে দিয়ে শুরু করি যে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজে বহিরাগত ছিলেন; তিনি যদি এই অঞ্চল পছন্দ না করতেন তবে বিশ্বভারতী এখানে বিকশিত হত না। এছাড়াও গুরুদেব ঠাকুর, তাঁর সহকর্মীরা - যারা বিশ্বভারতীকে জ্ঞান-সৃষ্টি এবং বিস্তারের কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তোলার পথ প্রশস্ত করেছিলেন - তারা সকলেই বোলপুরের বাইরে থেকে এসেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, প্রাক-শান্তিনিকেতন বোলপুর ছিল ঔপনিবেশিক বাংলার একটি ছোট্ট শহর। শহরের বাইরে থেকে এসে গুরুদেব এবং তাঁর সহকর্মীরা শুধু যে প্রকল্পটি শুরু করেছিলেন তা নয়, বিশ্ববিদ্যালয়টিকে বিশ্বের অন্যতম উদ্ভাবনী শিক্ষামূলক কেন্দ্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

২) দুর্ভাগ্যক্রমে, বাইরে থেকে শিক্ষক এবং শিক্ষাকর্মীদের আনার ধারাবাহিকতা বেশি দিন স্থায়ী হয়নি, কারণ যারা প্রাথমিকভাবে বিশ্বভারতীতে এসেছিলেন তাদের সন্তানরা কেবল ভূমি-পুত্র হওয়ার কারণেই চাকরির দাবিদার হয়ে ওঠে। উপযুক্ত যোগ্যতা না থাকা বা কম থাকা স্বত্বেও, এই ধারা ধীরে ধীরে ভূমি-পুত্রদের বিশেষ যোগ্যতা এবং জন্মগত অধিকার হয়ে ওঠে। এই করুণ ধারার অঢেল উদাহরণ আজও সুস্পষ্ট। তবে এই বার্তালাপে সেই বিষয়ে আমি যাচ্ছি না।

৩) ইতিহাস দেখিয়েছে যে আমাদের অনেক সহকর্মী যারা বাইরে থেকে এসেছিলেন তারা ধীরে ধীরে বিশ্বভারতীর প্রতিনিধিত্বকারী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে মগ্ন হয়ে পড়েছিলেন। এটা বলা অন্যায় হবে না যে, বাইরে থেকে যারা এসেছিলেন তাদের বসবাসের জন্য গুরুদেবের জমি বরাদ্দের সিদ্ধান্ত (যাতে করে তাঁদেরকে ক্যাম্পাসের একীকরণের কাজে যুক্ত করা যায়) এক নতুন রূপ

নিয়েছে: বাইরে থেকে যারা এসেছেন তাদের বেশিরভাগই এখানে একটি ফ্ল্যাট কিনেছেন বা একটি স্বাধীন বাড়ি তৈরি করেছেন। এটি প্রকাশ করে যে তথাকথিত বহিরাগতরা বিশ্বভারতীর সাথে সংহতভাবে সংযুক্ত হওয়ার জন্য গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করছিলেন।

4) এখানে আত্মজীবনীর ভাষায় আমি আমার অবস্থানটি যদি বর্ণনা করি: আমি ২০১৮র নভেম্বরে বিশ্বভারতীর উপাচার্য হিসাবে এখানে এসেছি; আমি এখানে প্রায় দুই বছরের কাছাকাছি আছি। এই সময়কালে, আমি বিশ্বভারতীর সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে পুরোপুরি নিমগ্ন হয়ে পড়েছি, যার ফলস্বরূপ আমি আমার পরিবার দিল্লিতে থাকা সত্ত্বেও খুব জরুরি না হলে সেখানে যেতে পারি না। আমি প্রতিটি সাপ্তাহিক বুধবারের উপাসণায় মন্দিরে অবশ্যই উপস্থিত থাকি; আমি ভোরের বৈতালিক উপভোগ করি; বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে একাত্মতা এবং সংযুক্তি তৈরির জন্য গুরুদেব প্রবর্তিত অন্যান্য সমস্ত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলিতে আমি যথাযথ ভাবে অংশগ্রহণ করি। এছাড়াও, গুরুদেব একজন কর্মী-চিন্তাবিদ ছিলেন: বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে বিশ্বের সাথে একীভূতভাবে যুক্ত হওয়ার নকশা অনুযায়ী ক্যাম্পাসের আশেপাশের পঞ্চাশটি গ্রাম গ্রহণ করেছিলেন। আমি এই গ্রামগুলিতে পরিকাঠামো তৈরি এবং পরিপূরক হিসাবে বিশেষ যত্ন নিয়েছি এবং দিল্লি ও অন্য জায়গা থেকে বই সংগ্রহ করে গ্রামীণ লাইব্রেরিগুলিতে সরবরাহ করেছি। কোভিড-১৯ অতিমারীর প্রাদুর্ভাবের সাথে সাথে আমার সহকর্মীরা, জীবিকার উৎস হারিয়ে যাওয়া অসহায় গ্রামবাসীদের সহায়তার জন্য তহবিল সংগ্রহ করতে কঠোর পরিশ্রম করেছিল। এই ত্রাণবিলি কার্যক্রম প্রায় তিন মাস (এপ্রিল-জুন, ২০২০) অব্যাহত ছিল। এখানেও, যারা বিভিন্ন ভাবে বিশ্বভারতির সাথে যুক্ত, ভূমি-পুত্র, ভূমি-কন্যা এবং তথাকথিত বহিরাগতরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই কাজে সহযোগীতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন।

৫) বাইরে থেকে আসা সহকর্মীরা যদি মানবিক গুণাবলির বিকাশ ঘটাতে গুরুদেব প্রবর্তিত সংস্কৃতি ও ক্রিয়াকলাপের সাথে নিজেদের প্রকৃত অর্থেই সম্পৃক্ত করে নিয়ে থাকেন, তারপরেও কি তাঁদের বহিরাগত বলা যায়, আমি এই বিষয়ে দ্বিধাগ্রস্ত। অন্যদিকে, তথাকথিত আশ্রমিক যারা গুরুদেব প্রবর্তিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান থেকে দূরে থাকেন ও আশ্রমের/বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতির সাথে কোনোরকম সম্পর্ক/খোঁজখবর রাখেন না এবং শুধুমাত্র ক্যাম্পাসে লালন-পালন ও "কেজি-থেকে-পিজি-থেকে-কর্মসংস্থান" এই ঐতিহ্যের বলে নিজেদেরকে 'রাবীন্দ্রিক' বলে দাবি করেন। এবারে আমি আমার বক্তব্য বর্ণনা দিচ্ছি। পৌষ উৎসব চলাকালীন, বিশ্বভারতী প্রচুর অনুষ্ঠানের আয়োজন করে যাতে আমাদের প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীরা (বিশ্বভারতীর ভাষায় 'প্রাক্তনী') উপস্থিত থাকেন; যখনই আমি তাদের কাছ থেকে আর্থিক অনুদানের প্রশ্নটি উত্থাপন

করি (সবাই না হলেও তাদের বেশিরভাগই এই ধরণের ক্রিয়াকলাপে নিযুক্ত থাকার কথা বলে ধন্যবাদ জানায়, যা তাদের নাম, খ্যাতি, এবং অন্যান্য সুবিধা দিয়েছে) আমার অনুরোধটি এখন পর্যন্ত কোনো ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া পাইনি। আমি আপনাদের আরও জানাতে পারি যে আমাদের ত্রাণ কার্যক্রম প্রায় তিন মাস ধরে মূলত তথাকথিত বহিরাগতদের অবদানের জন্যই চালানো সম্ভব হয়েছিল।

৬) এখন আমাদের নিজেকে দেখার এবং জিজ্ঞাসা করার সময়: রাবীন্দ্রিক এবং বহিরাগতদের মধ্যে বিভাজনের কি কোনো প্রয়োজন আছে, তা যদি গুরুদেবের ভাবনা চিন্তার প্রতি নিষ্ঠা ও দায়বদ্ধতার ভিত্তিতে না হয়ে শুধুমাত্র জন্ম-সূত্রে ভূমি-পুত্রের উপর নির্ভর করে হয়?

খ) **বিশ্বভারতীতে বেড়া / বাধা / প্রাচীর নির্মাণ**

১) আমার পাঠকদের মনে করিয়ে দিয়ে শুরু করতে পারি যে, গুরুদেব ঠাকুরের বেঁচে থাকাকালীন সময়ে শিক্ষার্থীদের সুরক্ষার জন্য চীনা ভবনটি একটি প্রাচীর দ্বারা ঘেরা হয়েছিল।

2) আসল পৌষমেলার মাঠ (বর্তমানে "পুরাতন মেলার মাঠ" হিসাবে পরিচিত) কমপক্ষে 30 বছর আগে বেড়া দেওয়া হয়েছিল। এই মাঠে সর্বসাধারণের প্রবেশ বেশ কয়েক বছর ধরে নিষিদ্ধ করা হয়েছে; এখানে কেবল সকালের পদচারণা করার অনুমতি রয়েছে, তবে এতে কারোর কোনো সমস্যা হয়নি। প্রকৃত অর্থে এই মাঠটি একটি ঐতিহ্যের মর্যাদা দাবি করে, কারণ এটি ১০০ বছরেরও বেশি পুরানো, তবে এটিতে বেড়া দেওয়া এবং প্রবেশ নিষিদ্ধ হওয়ার বিষয়ে কোনও আওয়াজ বা দাবী সংগঠিত হয়নি।

৩) "আশ্রম মাঠ" (দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতনের আশ্রমের অংশ হিসাবে ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক) একটি বিশাল খেলার মাঠ, এটি বর্তমান পৌষমেলা মাঠের প্রায় সমান। এটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে অস্থায়ী বেড়া দিয়ে এবং তারপরে স্থায়ী দেওয়াল-সহ-বেড়া দিয়ে ২০১১-১২ সালে ব্যারিকেড করা হয়েছিল। এটিতেও কারও কোনো সমস্যা ছিল না, বরং সকলেই এটি স্বাগত জানিয়েছিলেন, কারণ পাঠ ভবণের অধ্যক্ষ প্রতিদিন সকালে মদের বোতল অপসারণের বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন যাতে তাঁর ছাত্র-ছাত্রীরা খেলার মাঠটি ব্যবহার করতে পারে। কমপক্ষে সাত বছর আগে থেকে এই স্থানে প্রবেশ কেবলমাত্র শিক্ষার্থী এবং পদচারণার মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়েছে। এ নিয়ে কেউ কোনো আপত্তি করেননি।

৪) শ্রীনিকেতনে (কুঠিবাড়ীর নিকটবর্তী) আর একটি ঐতিহ্যবাহী খেলার মাঠ ২০০৫ থেকে ২০১৪ সালের মধ্যে কেবল দুটি প্রবেশদ্বার রেখে দিয়ে পুরো প্রাচীর / বেড়া করা হয়েছিল। ২০১৪ সাল থেকে এই মাঠেও প্রবেশ কেবল শিক্ষার্থী এবং পদচারণার মধ্যেই সীমাবদ্ধ করা হয়। এখানেও কেউ কোনও অভিযোগ উত্থাপন করেনি। বরং সকলেই খুশি যে এই স্থলটি তার প্রকৃত উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হচ্ছে। এই মাঠের মধ্যে অবাধ বিচরণ এবং পথ হিসেবে ব্যবহার বিশ্বভারতী যথাযথ ভাবেই বন্ধ করতে পেরেছে।

৫) বিনয় ভবনের মাঠটি ২০০৮-০৯ সালে প্রাচীর / বেড়া দেওয়া হয়েছিল। এর আয়তন ৭০ একরেরও বেশি! প্রাচীর / বেড়া দেওয়ার পর মাঠটির সমূহ উন্নতিকল্পে বিশ্বভারতী এই জমিটিতে গড়ে তুলেছে একটি আন্তর্জাতিক মানের সুইমিং পুল, একটি আভ্যন্তরীণ খেলা-ঘর এবং অন্যান্য অনেক সুবিধার ব্যবস্থা করা হয়েছে। যৌগিক শিল্প ও বিজ্ঞান বিভাগের উন্নতির জন্য একটি বিশাল পরিকাঠামোর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা রয়েছে। এমনকি জমিটি প্রাচীর / বেড়া দেওয়ার ফলে হেলিপ্যাড হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। সিএবি (ক্রিকেটণ এসোসিয়েশন অব বেঙ্গল) কর্মকর্তারা আগ্রহ প্রকাশ করায় বিশ্ববিদ্যালয় এই মাঠে রঞ্জি স্ট্যান্ডার্ড ক্রিকেট মাঠ গড়ে তুলতে বিশেষ উৎসাহি। এখানেও কোনো প্রতিবাদের কণ্ঠস্বর উত্থাপন হয়নি।

৬) বিনয় ভবনের এই "বারোয়ারি"র (সকলের জন্য ব্যবহৃত) মাঠ, বণভোজনের জায়গা হিসেবে ব্যবহৃত এবং ট্র্যাক্টর-চালকের প্রশিক্ষণ ক্ষেত্রকে একটি নিরাপদ শিক্ষামূলক জায়গায় রূপান্তর করতে কারো কি কোনো সমস্যা হয়েছিল? সকলের অবগতির জন্য জানাই, ২০০৭ সাল পর্যন্ত এই মাঠের মধ্যদিয়ে একটি পঞ্চায়েত রাস্তা সহ মোট ১০ টিরও বেশি জনসাধারণের ব্যবহারের রাস্তা ছিল। সম্ভবত পরিবেশটি স্বাস্থ্যকর না থাকায়, কোনও একাডেমিক বিভাগ সেখানে স্থানান্তর হতে রাজি ছিল না। প্রফেসর আর কে রায়, প্রাক্তন উপাচার্যদের মধ্যে অন্যতম, শারীরিক শিক্ষা বিভাগকে তাদের একাডেমিক কার্যক্রম সেখানে স্থানান্তর করতে বাধ্য করেছিলেন। তিনি মাঠটি দিয়ে চালকদের ট্রাক ও ট্রাক্টর না চালাবার অনুরোধ করার জন্য বেশ কয়েকবার নিজে মাঠ পরিদর্শন করেছেন। একজন প্রবীণ অধ্যাপক ২০০৮ সালে সেখানে একটি বড় কোয়ার্টার পেয়েছিলেন এবং সীমানা প্রাচীরটি শেষ হলে তিনি সেখানে নিরাপদে থাকবেন, এস্টেট অফিসার কর্তৃক আশ্বাস দেওয়া সত্ত্বেও তিনি কোয়ার্টারে বাসবাস করতে ভয় পান। এই সবদিক থেকে বলা যায় যে বিনয় ভবনের মাঠে প্রাচীর তৈরির কাজটি জমি এবং বাসিন্দাদের সুরক্ষিত করার জন্য স্বাগত, সময়োপোযোগী ছিল।

৭) বর্তমান পৌষ মেলা মাঠটি কোনও ঐতিহ্যকে উপস্থাপন করে না। ভারতে, ১০০ বছরেরও বেশি সময় ধরে কোনও বিল্ডিং বা পূর্বসীমা বিদ্যমান থাকার পরেই 'ঐতিহ্যের' মর্যাদা দেওয়া হয়। এই স্থলটি মহর্ষির শান্তিনিকেতন আশ্রমের অংশ ছিল না। বিশ্বভারতী আনুমানিক ৬০ বছর আগে এটি পরিগ্রহণ করেছিল। গুরুদেবের মৃত্যুর ২০ বছর পরে এখানে পৌষ মেলা শুরু হয়েছিল। ২০০৪ থেকে ২০১৩ সালের মধ্যে এই এই মাঠটির প্রান্তে তিন'টি বিশাল প্রবেশদ্বার (যার মধ্যে একটি প্রবেশদ্বার দুর্বৃত্তরা গত ১৭ই আগস্ট-এ পে-লোডার দিয়ে ভেঙে দিয়েছে) নির্মাণ করা হয়েছিল। এই মাঠটির দু'দিকে ইতিমধ্যে প্রাচীর বিদ্যমান রয়েছে। মাঠটির পশ্চিম দিকে, ২০০৫ সালে বিশ্ববিদ্যালয় ৬+২ ফুট উঁচু দেয়াল-কাম-বেড়া নির্মাণ করেছিল। মাঠের দক্ষিণ প্রান্তে ("কবরখানা"র পাশে), ২৫বছরেরও আগে থেকে একটি ৬ফুট উঁচু প্রাচীর রয়েছে (যেটি সম্প্রতি সম্ভবত রাজ্য সরকারের অর্থানুকূল্যে সংস্কার করা হয়েছে!)। কেবলমাত্র দক্ষিণ ও পূর্ব প্রান্ত এখন বেড়া বা প্রাচীরের অভাবে অরক্ষিত রয়ে গেছে, যদিও বিশ্ববিদ্যালয় ২০০৬ থেকে ২০১৭ সালের মধ্যে এই দুই প্রান্তে ৫০০ টিরও বেশি কংক্রিট স্তম্ভ তৈরি করেছিল, যাতে চার-চাকা গাড়ির অবাধ বিচরণ নিষিদ্ধ হয়েছে। ২০০৬ সালের আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় কার্যালয় এবং শান্তিনিকেতন থানার মধ্যবর্তী দূরত্ব কমিয়ে আনতে কয়েকশ চার-চাকা গাড়ি প্রতিদিন এই মাঠটির ভিতর দিয়ে চলাচল করত। এই অভ্যাস বিশ্ববিদ্যালয় যথাযথ ভাবে বন্ধ করেছে।

৮) এছাড়াও অন্যান্য উন্নয়ন হয়েছে (এবং নির্মাণ!)। ১৯৯০ এর আগে এখানে বিভিন্ন রুটে চলাচলের জন্য একটি বাসস্ট্যান্ড ছিল। ১৯৯০ এর দশকে এটি সরকার দ্বারা সরানো হয়েছিল (এবং বেশিরভাগ বাসের রুটগুলি অন্যদিকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল)। ২০০৫ সালে তৎকালীন ডি এম (বীরভূম) মিঃ খলিল আহমেদের নেতৃত্বে জেলা প্রশাসন শান্তিনিকেতনে প্রবেশের এই প্রবেশদ্বারে সরকারী / বিশ্বভারতীর জমিগুলি থেকে দখলমুক্ত করতে এই মাঠের আশেপাশে একটি বিশাল উচ্ছেদের অভিযান চালিয়েছিলেন। মিঃ আহমেদ ২০০৩-২০০৪ সালে শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনে প্রবেশের স্থান থেকে দখলমুক্ত করার জন্য একাধিক সভা আহ্বান করেছিলেন এবং তাঁর প্রশাসনের পরামর্শেই এবং সহযোগীতায় বিশ্বভারতী ২০০৪-০৫ সালে প্রথমবারের মতো মেলা মাঠের আশেপাশে প্রাচীর স্থাপন করতে পেরেছিল।

৯) ২০০৯-২০১০ সালে, জেলা পুলিশের সহায়তায় বিশ্বভারতীর দ্বারা পরিচালিত উচ্ছেদ অভিযানে মেলা মাঠের সমস্ত অননুমোদিত স্টল সরানো সম্ভব হয়েছিল। ২০১৩-১৪ সালে, সিপিডব্লিউডি প্রায় ৬০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে দুটি বড় 'অর্থ/দাম দিন ও ব্যবহার করুন' এই ভিত্তিতে ব্যবহারের জন্য শৌচাগার (২০ বছর আগে নির্মিত ছাড়াও) নির্মাণ করেছিল। ২০১৪ সালে, নিশা হোটেলের সামনের গেট

দিয়ে বিক্রেতাদের এবং গাড়ির প্রবেশ বন্ধ করা হয়েছিল। ন্যূনতম ১০০ টাকা পার্কিং ফি দিয়ে মাঠের দক্ষিণ পশ্চিম কোণে কেবলমাত্র ট্যুরিস্ট বাসের প্রবেশের অনুমতি ছিল।

১০) বর্তমানে, শান্তিনিকেতন ট্রাস্টের সহযোগিতায় বিশ্ববিদ্যালয় অন্য দুই প্রান্তের ন্যায় মাঠটির পূর্ব এবং উত্তর প্রান্তে দেওয়াল-কাম-বেড়া (৪.৮ ফুট দেওয়াল + ৩ ফুট নেটের বেড়া) নির্মাণ শুরু করেছে। কেন্দ্রীয় সরকার / ইউজিসির নির্দেশনা এবং সিএজি বিশেষ সুরক্ষা নিরীক্ষণের সুপারিশ অনুসারে ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার একটি অংশ হিসেবে বিশ্বভারতীর সম্পত্তি/ক্যাম্পাস সুরক্ষায় প্রাচীর / বেড়া দেওয়ার কাজ শুরু করেছে। এছাড়াও মহামান্য এনজিটির আদেশানুসারে পৌষমেলার মাঠকে নির্দিষ্ট করতে বিশ্বভারতী সদা-সচেষ্ট এবং এই বেড়া /প্রাচীর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার পরিবেশ এবং আবাসিক অঞ্চলগুলি থেকে পৃথক করতেও সাহায্য করবে।

১১) এখানে উল্লেখ্য যে এই মাঠটির ৫০ মিটারের মধ্যে রয়েছে - বিশ্বভারতীর প্রায় ২০ টি বিভাগ (৪০০০ (চার হাজার) শিক্ষার্থী সহ), ৮০টি আবাসিক ভবন, ৪ (চার)টি গেস্ট হাউস (বিদেশী গবেষকদের জন্য ২টি সহ), ২টি ছাত্রাবাস (৫০০ আবাসিক), কেন্দ্রীয় কার্যালয় (যেখানে ৫০০র অধিক কর্মী কাজ করেন), কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, এবং গ্ণিত্র সদন (ইন্টারনেট যোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র), ইত্যাদি, ইত্যাদি। এনজিটির নির্দেশ অনুসারে আমাদের অবশ্যই একাধিক দূষণ এবং বর্জ্য-পরিচালনার সমস্যা রয়েছে, তবে প্রাচীর / বেড়া দেওয়ার আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ রয়েছে: আমাদের শিক্ষার্থীদের জন্য পর্যাপ্ত নিরাপত্তা এবং শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করা।

12) কোনও ব্যবসায়িক গোষ্ঠীর বিশেষ স্বার্থ এবং দুর্বৃত্তদের কোনও হুমকি কোনও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে এই অধিকার প্রয়োগ থেকে বিরত রাখতে পারে না।

আমি বরাবরের মত আপনাদের সামাজিক ভাবে সংযুক্ত থাকাকালীন প্রত্যেককে শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখার আহ্বান জানিয়ে এই বার্তালাপ শেষ করছি।

আস্থা রাখুন, বিশ্বভারতীর উন্নতিতকল্পে আন্তরিকভাবে সহযোগীতা করুন।

বিদ্যুৎ চক্রবর্তী
২২/৬/২০২০

বিদ্যুৎ চক্রবর্তী
উপাচার্য, বিশ্বভারতী

বিশ্বভারতী
শান্তিনিকেতন

Vice-Chancellor
Visva-Bharati
Santiniketan
West Bengal-731235
India